Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-III, January 2016, Page No. 08-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভক্তি আন্দোলনসূত্রে নারীর শ্রেষ্ঠতাঃ প্রভু জগদ্বন্ধুর

নির্মল বন্ধু দাস
ছাত্র গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. পি., ভারত

Abstract

As far as our knowledge is concerned 'Bhakti Movement` in the Indian subcontinent had its inception in the southern part of India; and Tamil 'aleya` community was a leading force in that movement. This Tamil community had a woman as its central figure in the movement which led to the proliferation of the roles of the women in the subsequent 'Bhakti movement` in 'Gourangalia`. Bengali women in the light and pretext of deliverance and aura of Gouranga Mahaprabhu started to believe and prepare themselves for the sacrifice required for the society of large. As a natural consequence to this attitude we observe women in Bengal as the driving force that dictated the orientation of Vaisnavi Movement in contemporary Bengal. Amongst these women figures three name deserve a special mention; they are Sitadevi, Janhavi Devi, and Hemlota thakurani. They led thousands of people come from the darkness of ignorance to the light of deliverance and divine bliss. We need to perceive the glory and greatness of Bengali women in relation to the movement led by Prabhu Jagatbandu Sundar. The main thrust of this article is to study the phenomenon of liberation of the women towards the end of the nineteenth century was occasioned by the 'Bhakti Movement` led by Prabhu Jagatbandu Sundar.

যতদূর জানা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ভক্তি আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। আর সেই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তামিল আলেয়া সম্প্রদায়। নবম শতকের শেষ দিকে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে আসেন এক নারী। নাম, অন্তাল অর্থাৎ যিনি চালিত করেন। তিনি ও তাঁর পিতা পেরাইয়াল্লয়ার ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে 'পতিত' বলে চিহ্নিত হলেও পরবর্তীকালে আলেয়ারদের 'তিরুরায়মোল্লি' গ্রন্থটিকে উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবরা বেদের সমান সম্মান দিতে বাধ্য হয়। ভক্তিধর্মের তাত্ত্বিকতা থেকে বহুদূরে ছিল অন্তাল নির্দেশিত আলেয়ার সম্প্রদায়ের সাধনা। জাতবিচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের উর্ধ্বে উঠে বাসুদেব কৃষ্ণের চিন্তনে চিত্তশুদ্ধির সাধনা ছিল তাঁদের লক্ষ্য ; নৈতিক জীবনধারা ও মানসিক উৎকর্ষ ছিল একমাত্র কাম্য। অন্তালের জীবনকথা নানা জনশ্রুতিতে আচ্ছন্ন। দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, কলিযুগে ভূদেবী বা ভূমি কন্যা শিশু হয়ে এক তুলসী বৃক্ষের নিচে জন্মেছিল। এই গাছটি ছিল পল্লব রাজাদের রাজধানী কাঞ্চিপুরম্ থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে এবং পুন্ড্য রাজধানী মাদুরাই থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'শ্রীভিল্লিপুতর্ ' মন্দিরে। কৃষ্ণভক্ত বিষ্ণুচিত্ত তাঁকে কন্যা হিসেবে মানুষ করেন ও নাম রাখেন ঈশ্বরী বা 'গোড্ডা'। কিশোরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গোড্ডা' কৃষ্ণের প্রতি শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণ বোধ করেন এবং তাঁকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃষ্ণমিলনের গভীর অনুভবজনিত সত্য থেকে 'গোড্ডা' পনেরোটি 'তিরুপ্পাওয়াই' (তেরটি স্তবকে বিভাজিত এক একটি সম্পূর্ণ ভাব) ও বহু 'তিরুমোল্লি'(হৃদয়ের বিশেষ ভাবপ্রকাশক চৌদ্দটি পদের একেকটি গুচ্ছ) রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ভিদ্যা দাহেজ্জা এর উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য-

"কেবল সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্মীয় আবেদনের জন্যই নয়, এই তামিল পদাবলীগুলি ভারতীয় সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।"[১]

কথিত আছে , স্বয়ং ভগবানের আদেশে 'গোড্ডা' শ্রীরঙ্গম মন্দিরে রঙ্গনাথের মূর্তির মধ্যে লীন হয়ে যান। ভক্তরা মনে করেন, এই বিলীন হওয়ার মধ্য দিয়ে 'গোড্ডা' তাঁর স্বরূপে অর্থাৎ ধরিত্রীরূপে (যা মূলতঃ তামিল শাস্ত্রে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরমাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর গর্ভরূপে বর্ণিত) ফিরে যান। গোড্ডার পদাবলীতে রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক সকল অনুশাসনবদ্ধতা থেকে মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ। তাই দাক্ষিণাত্যের আলেয়ার সম্প্রদায়ের কাছে তিনিই 'অন্তাল' বা পথ প্রদর্শক। তাঁর পালক পিতা বিষ্ণুচিত্ত হলেন 'পেরাইয়াল্লার' বা প্রধান আলেয়ার।

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তি আন্দোলনে আরেক 'অন্তালে'র সন্ধান পাই আমরা দ্বাদশ শতকে। ইনি কাঞ্চিপুরম্ থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে 'কুদ্দম' অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। রামানুজের শিষ্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আচার্য্য কুড়েশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ; আচার্য পরাশর ভত্তর্ ছিলেন তাঁর পুত্র। বহিনাবাইয়ের জীবন তাঁর ছিল না; কুড্ডমের কেশবপেরুমল্ল মন্দিরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পূজারী ছিলেন। পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার কারণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে তাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণের তুল্য সম্মান পেতেন। স্বামী ও পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুজনিত বিপর্যয়ে এই বৈষ্ণবীয় 'ভক্তির' আশ্রয়ে শক্তি ও মানসিক মুক্তি অর্জন করে হয়ে উঠেছিলেন দাক্ষিণাত্যের রামানুজ সম্প্রদায়ের আর এক 'অন্তাল'।

বাংলার বাইরে ভক্তি আন্দোলনের এই চালচিত্রে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করতে পারি, মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক অবকাঠামোয় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন নারীরা নানাভাবে ভক্তির আশ্রয়ে আত্মউন্মোচন ও আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন।
এরপর নারী ভক্তি আন্দোলনের বিস্তৃত রূপ লক্ষ্য করা গৌরাঙ্গলীলায়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও অদ্বৈত, নিত্যানন্দ পরিচালিত ভক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে বৈষ্ণবতার আশ্রয়ে বাঙালি নারীরা ক্রমশঃ তাঁদের ব্যক্তিগত সময়কে ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এরই অনিবার্যতায় গৌরাঙ্গদেবের পর বাংলায় বৈষ্ণবীয় আন্দোলন পরিচালনার মুখ্য সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল মেয়েরা। একথা স্বীকার করতেই হবে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেমন নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল মূলতঃ পরিবারের উদার মনস্ক পুরুষদের সহায়তা ও সহযোগিতায়, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও তেমনি বাঙালি বৈষ্ণব নারী স্মৃতিশাসিত রক্তচক্ষুকে অনায়সে উপেক্ষা করেছিল পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায়। আত্ম অন্বেষণের প্রাথমিক পর্বে এই শৃঙ্খলটুকু স্বীকার করে বাঙালিনী ক্রমশঃ আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করেছিল। সেখানে জাহ্নবাদেবী, সীতাদেবী, হেমলতা ঠাকুরাণীর মতো আচার নিষ্ঠ নারীরা ভক্তি আন্দোলন পরিচালকের দায়িত্ব নেন। এ প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে ১৩ জন বৈষ্ণবী কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া 'প্রেমবিলাস', অনুরাগবল্লী', ভক্তিরত্নাকর', এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান সূত্রে অন্ততঃ ৩০ থেকে ৩৫ জন বৈষ্ণবীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা শুধু শিক্ষিতাই ছিলেন না; ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্ত্রীগুরু হিসেবে বিশেষ সম্মানিতা। ধর্মসূত্রে নারীর এমন স্তরান্তরের সদর্থক ও নঞর্থক দিক বিস্তারিতভাবে আলোচিত Karen Sinclair এর Women and Religion -এর মতো লেখায়।

Karen Sinclair, Women and Religion, the Feminist Press, New York, 1986, Page 107-124

তবু এঁদেরই মধ্যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে আলোচনা যোগ্য। এঁরা হলেন সীতাদেবী, জাহ্নবা দেবী এবং হেমলতা ঠাকুরাণী। যাঁরা চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ক্রমশঃ অন্তপুরের সীমানা পার হয়ে তাঁরা আন্দোলনের প্রকাশ্যে নেতৃত্বে দেন। শুধু নেতৃত্বই দেননি তাঁদের অনুপ্রেরণায় সেদিন হাজার হাজার মানুষ অন্ধকার পথ পদদলিত করে পরম পবিত্র রাগানুগা ভক্তির পথে ধাবিত হন। অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত সমাজসীমায় নিরক্ত 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়ে উঠেছিল নারীত্বের নতুন সংজ্ঞা বিনির্মাণ ও শিল্পে সংরক্ত নারীর আত্মনির্মাণের অনিবার্য মাধ্যম। এই প্রেক্ষিতে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলন সূত্রে বাঙালিনীর শ্রেষ্ঠতা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মানব সাম্যের লক্ষ্যে সংগঠিত প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলন সূত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান্তর, অন্দরমুক্তি থেকে ক্রমে অন্তরমুক্তির রেখাচিত্র ও সেই উত্তরণের উত্তরাধিকারটুকুই এই প্রবন্ধে আলোচিত।
গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীজীর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী', লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারীজীর 'বন্ধুলীলা সুধানিধি', ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর 'বন্ধুলীলা মাধুরী', শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর 'মহা-মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু', স্বামী জগদানন্দ ভারতীর 'প্রভু জগদ্বন্ধু লীলামৃত' সুরেশ চক্রবর্তীর 'বন্ধুকথা', এবং মহেন্দ্র কাব্যতীর্থের 'বন্ধু-বার্তা' এই প্রাথমিক সূত্রগুলি থেকে আমরা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের লীলাকালীন নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অবস্থাতর চিনে নিতে পারি।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাবকালীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে আলেখ্য চিত্র জগদ্বন্ধু-জীবনীকার শ্রীমৎ গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীজী তাঁর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর' কারুণ্যামৃত ধারায় চিত্রিত করেছেন, তা থেকে তৎকালীন নারী সমাজের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। সেই সমাজে কৌলিন্য প্রথার নিপীড়নে, মানুষ বিকিকিনির বাজারে নারীরা ছিল ঘরে বাইরে বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা ও নিপীড়িতা। সব মিলিয়ে সেদিন বাংলায় ছিল এক শ্বাসরুদ্ধকর চরম সংকটাপন্ন অবস্থা। শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নাতি মনীন্দ্রকুমার-যে নামীদামি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নানা অবিচার, ব্যভিচারে মত্ত ছিল। প্রকাশ্য কলকাতার রাজপথে মদ্যপান করা থেকে পতিতালয়ে যাওয়া পর্যন্ত এমন কোন হীন কাজ ছিল না, যা করতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করত।

'কত ভয়ঙ্কর মহাপাপী মুই, আপনারে কই সত্যই বটে।
বাড়ীতে যে বড় চৌবাচ্চাটা আছে তিন চৌবাচ্চা মদ গেছে এ পেটে।।
কী সব জঘন্য পাপ করিয়াছি ভাবিতেও এবে ঘৃণা উদয়।
এত পাপী বলি পতিতপাবন এ অধম প্রতি অনুগ্রহময়।।''[২]

অর্থাৎ কুমার মণীন্দ্রের মত ব্যভিচারী বহু মানুষের ভোগোন্মত্ত জীবনাচরণ সে দিন বাংলার আকাশ-বাতাসকে বিষিয়ে তুলেছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর আদর্শ বিচ্যুতির পথে দ্রুত ধাবমান মানব-সমাজকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু 'প্রবুদ্ধ' বাঙালি ভক্তির তত্ত্বে মুক্তির অনুসন্ধান শুরু করেন। তাদেরই হয়ে হারাণক্ষ্যাপা আন্দোলনের নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন জগদ্বন্ধু চক্রবর্তীকে। অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন বামা-পুত্র। তাই সেই ভক্তি আন্দোলনে জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদের মতো লিঙ্গবৈষম্য ছিল না। জগদ্বন্ধু সুন্দরের নেতৃত্বে সেদিন সর্বস্তরের মানুষ এক পরিপূর্ণ মানবিক, জাত-পাত হীন উদার সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। উচ্চারিত হয়েছিল, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এক অমোঘ প্রতিবাদের ভাষা-

'আমি সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেবো'। প্রভু জগদ্বন্ধু

প্রতিবাদের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত সহজ, সরল। সংগীত ও নৃত্যের আশ্রয়ে সেদিন নামকীর্তন ও নগরকীর্তনকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার ক'রে প্রভু জগদ্বন্ধু সকলকে ডাক দিয়ে বলেছেন-

"হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
যদি সৃষ্টি রাখ ভাই, হরিনাম প্রচার কর।।''[৩]

সেদিন সংগীতেও ছিল না শাস্ত্রীয় নির্দেশের কাঠিন্য, নৃত্যেও ছিলনা বিধিবদ্ধ তাল-লয়ের পদক্ষেপ। শুধু পরম পবিত্র নির্মল ভালবাসার প্রবল টানে সেদিন 'চন্ডাল-ব্রাহ্মণে কুলাকুলি' সম্ভব হয়েছিল। আর সংকীর্তনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েরা-কুলবধুরা। স্মৃতিশাসনের প্রাচীর ভেঙে ফেলেছিল মেয়েরা নিজেই।

দীর্ঘদিন 'ভক্তিভরে স্বামীর পাদোদক' পানে ক্লান্ত কিংবা পতিতা নারীদের শুষ্ক জীবনে সেদিন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই নেমে এসেছিল মুক্তির অনাবিল আনন্দ। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এই সব নারীরা দেবতা 'কৃষ্ণের' চেয়ে ব্যক্তিত্বশালী দক্ষ নেতা 'গূঢ় মানুষ' প্রভু জগদ্বন্ধুকেই অনেক বেশি হৃদয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ বহু শতক ধরে পতিতার কামনা, বাসনা, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার যে অবদমন অস্বীকৃতি সমাজে প্রচলিত ছিল; কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত সেই নারীদেরও ব্যক্তি-স্বাধীনতার গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর মহাউদ্ধারণ লীলায়। যাই হোক এটা অভ্রান্ত সত্য যে জগদ্বন্ধু সুন্দরেরর ভক্তি আন্দোলন নারীদের জীবনাচরণে স্বাধিকার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই সময় যেসব নারীরা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের পবিত্র জীবনাচরণ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন কিংবা তাঁর জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে একবার বলে নেওয়া দরকার বন্ধুসুন্দরের বড়দিদি দিগম্বরীর কথাও। তিনি কিন্তু নিছক অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী ছিলেন না। অপরিমেয় প্রেম ভক্তি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তাঁর। যদিও জগদ্বন্ধু জীবনীকারেরা দেখিয়েছেন শিশু জগৎ-এর (জগদ্বন্ধু) অলৌকিকত্ব নিয়ে দিগম্বরী দেবী প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন, তবু তেমন ভাবে ভক্তির প্রাবল্য তাঁকে গ্রাস করতে

পারে নি। তাই সঙ্গীদের সাথে গোবিন্দপুর শ্মাশনে মড়ার খাটিয়ার উপর শুয়ে থাকার কথা শুনে দিদি জগৎ সুন্দরকে বলেন- 'জগৎ তুই স্নান করিয়া ঘরে আয়, অশুচি ছুঁয়েছিস।''

'শ্মাশানেতে যায় মরা -খাটিয়ায় সানন্দে শয়ন করিয়া রয়।
দিদি দিগম্বরী 'আয়, আয়' ডাকে, জলঢালি গায়ে ঘরেতে রয়।।'[৪]

এ ক্ষেত্রে আমরা অনুমান করতে পারি জগৎ সুন্দরের মন, মনন, ঔদার্য, মানবিকতাবোধের উৎসমুখে নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমরা দেখি, বৈষ্ণব সমাজে শিশুর শিক্ষা শুরু হত দিদি বা মায়ের কাছ থেকেই ; তাকে কথা বলতে শেখানো, তার হাত, পা, মুখ ইত্যাদি চেনানোর দায়িত্ব ছিল মা অথবা দিদির। শুধু তাই নয়, শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় তাঁরা পুরাণের গল্পও শোনাতেন। অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহাসিক জ্ঞান ছিল তাদের আয়ত্তাধীন। এ প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধুর জীবনীকার লিখেছেন- 'বনের কোণে ঘুঘু কি বলে, জগৎ জানিতে চায়। দিদি বলেন, ঘুঘু ডাকে, ঠাকুর-গোপাল উঠ উঠ উঠ। জগৎ (জগদ্বন্ধু) প্রত্যেকটি ডাকের অনুকরণ করিয়া মধুর স্বরে সুর টানিয়া টানিয়া বলিতে থাকে, ঠাকুর-গোপাল উঠ উঠ উঠ'।[৫]
সাধারণতঃ সেই যুগে সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর স্ব-ইচ্ছা ছিল মর্যাদাহীন; ব্রাহ্মণ সমাজে ঘটকের মাধ্যমে গৌরীদানের প্রথা ছিল। কিন্তু 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী' সূত্রে জানা যায়, একমাত্র বৈষ্ণব সমাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের স্ব-ইচ্ছা ছিল চোখে পড়ার মতো। অতুল চম্পটীপত্নী ক্ষিরোদা দেবী স্বেচ্ছায় পাত্র নির্বাচন করেছিলেন; নবদ্বীপচন্দ্র স্বনির্বাচিত পত্নীকে অঙ্গীকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়; কৌলিন্যপ্রথা শাসিত ব্রাহ্মণসমাজের পণপ্রথা জনিত অভিশাপ থেকেও মুক্ত ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন নারীদের জীবন। বৈষ্ণব সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথাও সংকোচন হয়।

ক্ষিরোদা দেবী জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলনের গোড়া থেকেই ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর স্বামী অতুল চম্পটী ছিলেন রূপে গুণে অতুলনীয়। ইংরেজী, অঙ্ক ও সংস্কৃত তিন বিষয়ে অনার্স সহ বি, এ পাশ। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ গৌরীশঙ্কর মহাশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র। তার সত্ত্বেও প্রভু বন্ধুসুন্দরের কয়েকটি প্রেমামৃত কথা তার জীবনকে পুরোপুরি পরিবর্তন করেদিয়েছে। কথা কয়টি হলো :

'দেখুন, দুঃখময় এই মায়ার সংসারে একমাত্র কৃষ্ণভজনই সার; আপনি মায়ায় আবদ্ধ থাকবেন না, আপনার দ্বারা আমার অনেক কাজ আছে।'[৬]
৬। ব্রহ্মচারী, গোপীবন্ধু, 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল-৫৯, পৃ-১০১

কথা কয়টি চিরকালের পুরানো কথা হলেও স্থান-কাল ভেদে ও প্রকাশ -ভঙ্গিতে অতুলের কাছে পাষাণে দাগকাটার মত মর্মস্পশী হয়ে উঠেছে। তাই তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে পরম মাধুর্যের মূর্তি প্রভু বন্ধুসুন্দরের প্রবল প্রেমের আকর্ষণে হরিনামের মাতোয়ারা বৈরাগী হয়েছেন। নামের শক্তি, কৃপার শক্তি সব মিলে অতুলকে পরম প্রেমের পথে তুলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী'' গ্রন্থে শ্রীমৎ গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীজী বলেছেন :

'চম্পটীর কঠোর বৈরাগ্য দেখিলে দাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। ঘরে সুন্দরী ভার্য্যা, রত্নসমা কন্যা, গৃহে বিপুল ঐশ্বর্য, বংশ মর্য্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সব তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে বন্ধু-প্রেমের প্রখর স্রোতে।'[৭]

শেষ পর্যন্ত চম্পটী ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করে আত্মজীবনকে আত্মোন্নতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সংসার ত্যাগের মধ্য দিয়ে পত্নী ক্ষিরোদাকে তিনি শুধুই অসম্মান করেছিলেন, এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। কেননা, গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীজীর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী' গ্রন্থে সংসার ত্যাগের আগে অতুল চম্পটীর দাম্পত্য জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তাতে স্ত্রীর প্রতি গভীর মমত্ব ও সহমর্মিতারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংকীর্তনের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন প্রভু বন্ধুসুন্দর দেখেছিলেন, এবং যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে অতুল চম্পটী ঘর ছেড়েছিলেন, তারই পুরোভাগে সেদিন তিনি স্ত্রীকে রাখতে চেয়েছিলেন। সহমর্মী ক্ষিরোদার তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বলে, জগদ্বন্ধুর ভক্তি আন্দোলনে আমরা দেখি তাঁর অন্য অবস্থান। জগদ্বন্ধুর জীবনী সাহিত্যের কোথাও স্বামীর সংসার ত্যাগের জন্য, কিংবা সংসার বিমুখতার জন্য তাকে দায়ী করা হয় নি। এও জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলন সূত্রে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থান্তরেরই ইঙ্গিত বহন করে।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলনে আরেকটি আলোচিত নাম লক্ষ্মী। যাঁর কথা না বললে হয়ত বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি ছিলেন নদীয়া জেলার ডিপুটি ম্যাজিস্টেট শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা। মহেন্দ্রবাবু উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। অনেক বিষয় অনেক কিছু জানা শোনা আছে। কিন্তু ধর্ম বিষয় বড় একটা আলোচনা করেন না। তৎকালীন বহু শিক্ষিত লোকেরই এই অবস্থা। সেই রক্ষণশীল সমাজ থেকে উত্তরণ ঘটেছে লক্ষ্মীদেবীর জীবন। কৌলিন্যপ্রথা শাসিত বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা অন্বেষণে অসাধারণ দৃষ্টান্ত লক্ষ্মীদেবীর কয়েকটি চিঠি। এই চিঠিগুলিতে প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীর গভীর প্রেমার্তি, ঐকান্তিক আত্মনিবেদন এবং সুতীব্র আক্ষেপানুরাগ ও বিরহ-বিলাপ চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন পুরুষ শাসিত সমাজে তিনি যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল অদ্বৈতপন্থীদেরই নয়, বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজেও সৃষ্টি করেছিলেন এক আলোড়িত অধ্যায়।

"বন্ধু ! আমি সংযম-মন্দিরে তোমার অনুগত।
আমি ভক্তি-মন্দিরে তোমায় ভালবাসি।
আমি প্রেম-মন্দিরে তোমায় পূজা করি
আমি স্থিরতা-মন্দিরে তোমার পাদস্পর্শ লাভ করি।
আমি আনন্দ-মন্দিরে তোমার নয়ন দর্শন করি।
আমি আবেশ-মন্দিরে তোমাকে অনুভব করি।
আমি ধ্যান-মন্দিরে তোমার জন্য প্রযত্ন করি।
আমি শান্তি-মন্দিরে তোমায় উপভোগ করি।
বন্ধু ! আমি দুষ্ট হই বা শান্ত হই, আমি তোমারই।
আমি সাধু হই বা পাপী হই, আমি তোমারই।
যেহেতু, তোমার সম্পূর্ণতার অপনেয় মূর্তি
আমার মধ্যে বিরাজিত। আমার বাহ্যিক
মূঢ়তায়, কলঙ্ক অপনয়ন করিতে এবং তুমি ও
আমি একই স্থানে ছিলাম ও আছি এই বোধ
করিয়া যেন তোমা ছাড়া না হই।
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
সুষুপ্তির গভীর হ'তে জাগি, আমি উঠিলাম
যবে জাগ্রতের ঘূর্ণ্যমান সোপান উপর, চুপে
চুপে কে কহিল কর্ণে-
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
তুমি যে আমার জীবন। রাত্রি বিরহের পরে
উল্লাসে উঠিয়া বসি উষার আসনে উচ্চারিবে
তালে তালে আমার পরাণ-
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
আঁকা বাঁকা সোজা পথে যেথায় সেথায় যাই,
আলোকেতে আঁধারেতে যেথাই বেড়াই,
সেথায় আমার মন তব দিকে অনুক্ষণ চাহিয়া
রহিবে। কর্ম-যুদ্ধে ঝাঁপাইব হুঙ্কারিয়া তব নাম,
গাহিব অবিরাম-
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
দৈব আকাশের মেঘ যবে, দুঃখ বজ্র করিবে
নিনাদ। সে শব্দ করিব স্তব্ধ ফুৎকারিয়া তব
নাম-

বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
তন্তুবায় মন মোর নিদ্রা বস্ত্রোপরি বুনিতে
শিখিবে যবে স্বপন সুন্দর সেথায় তোমার নাম
বুনিব প্রথম ওগো প্রাণের-
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !
গভীর হইলে নিশি সুষুপ্তির ঘরে, ডাক যবে
অবিরত সুশান্তি আমায়, আনন্দে আনন্দে
আসে নাচিয়া গাহিয়া মরমের সখা তুমি-
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !'[৮]

লক্ষ্মীর আরও একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে :

'আমার অন্তরের নিভৃত কন্দরে তোমার জন্য সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়াছি। তোমার প্রতীক্ষায় আমার আনন্দ-প্রদীপ ক্ষীণাভ। তোমার আগমনে তাহা সমুজ্জ্বল হইবে। তোমার আগমন হউক বা না হউক, যাবৎ অশ্রু শরীরকে দ্রবীভূত না করে, তাবৎ আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব। তোমার তুষ্টির জন্য আমার প্রেম-সুরভিত অশ্রু তোমার শান্তিময় চরণ সিক্ত করিবে। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আমার হৃদয়-সিংহাসন শূন্য থাকিবে।

তোমার নিকট কিছু বলিব না, কিছুই চাহিব না। আমি এইমাত্র জানিয়া থাকিব যে, তোমার প্রতিক্ষায় রত আমার হৃদয়ের ব্যাথা তুমি অবগত আছ। তোমার প্রেম আমার ভক্তি-স্পন্দিরে চির জাজ্বল্যমান হউক। আমি যেন সকলের অন্তরে তোমার প্রেম উন্মেষিত করিতে পারি। তুমি আমার ভগ্ন চিন্তা তরীর কাণ্ডারী হও।''[৯]

প্রসঙ্গতঃ মনে করিয়ে দেই, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্তি আন্দোলন শুধু নারীকে অবরোধ থেকে মুক্তি দিয়েছিল তা নয়, সমাজে স্বাধীন পথ হাঁটারও সম্মান দিয়েছিল। লক্ষ্মীদেবী তাঁর এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সমাজের বহু মতান্তর ও মনান্তরকে বৃন্দাবনী ভজনের আশ্রয়ে একসূত্র বাধঁতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রভু জগদ্বন্ধুর ধর্মান্দোলনসূত্রে নারীদের সামাজিক উর্ধ্বায়নের প্রবহমানতাও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণীয় বৈষ্ণবতার সংকীর্ণ আশ্রয় ছেড়ে বর্ণাশ্রমবিরোধী মানবিকতার বৃহৎ ক্যানভাসে নিজের গতিপথ তৈরি করে নিয়েছে।

প্রভু জগদ্বন্ধু সবসময় নারী সংসর্গ বর্জন করে চলতেন এবং তাঁর ভক্তদেরও সেই উপদেশ দিতেন। বলতেন, ভব বন্ধন নারী। নারী সম্পর্কে কঠোরতম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ছোট জয়নিতাই বর্জনে। ছোট জয়নিতাইকে বর্জন ও দুঃখ তাঁর আত্মহননের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অনেকেই তাঁকে নারী বিদ্বেষী বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের একথাও মনে রাখা দরকার, এই প্রভু জগদ্বন্ধুই ফরিদপুর ও কলকাতা থাকাকালীন সমাজ পরিত্যক্তা পতিতা যাদুমণি, খুকি ও সুরতকুমারী সহ বহু পতিতা নারীদের হরিনামে শুচি স্নাত করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দু'জন যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা হলেন, যাদুমণি বাইজী ও সুরতকুমারী। যাদুমণি ছিলেন শোভাবাজারের জমিদার কুমার মণীন্দ্রদেব বাহাদুরের রক্ষিতা। বারবনিতা হলেও তার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। সুন্দরী তো বটেই, তিনি ছিলেন সুকণ্ঠী গায়িকা। তার সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল বাইজী পাড়ার চারদিকে। তিনি ছিলেন পতিতাদের মধ্যে কুলীন, বিলাসিনীদের মধ্যে বিলাসিনী। কিন্তু অতুল চম্পটীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকেই তার মনের স্রোত উল্টো বইতে শুরু করে। তিনি পুরাতন বেশভূষা ছেড়ে দিয়ে মগ্ন হলেন প্রভুর কথা ও গানে। শুধু তাই নয়, তিনি কীর্তন শিখলেন এবং প্রভু বন্ধুসুন্দরের রচিত গান গ্রামোফোনে কীর্তন করে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। মূলতঃ সেই সময় থেকেই তিনি প্রভুর আকর্ষণে এক নতুন জীবনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেন।

সুরতকুমারী ছিলেন অসামান্য রূপ-যৌবনা, রমণীয় অঙ্গের সৌষ্ঠব, শ্রী ও লালিত্য সম্পন্না বারবণিতা। যার দৃষ্টি পড়ে তার নয়ন মধুপান লোলুপ ভ্রমরের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠে। সোনাগাছি বারবণিতা পল্লীর গৌরব এবং বর্ধমানের মহারাজের রক্ষিতা। তিনি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় বি, এ পাশ। এ প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধুর জীবনীকার গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী তাঁর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বলেছেন- 'তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। মেমদের গাউন পরিধান করিলে তাঁহাকে

ইউরোপীয়ান মহিলার মত দেখাইত। কোন সময় তিনি বর্ধমানের মহারাজ কুমারের ভালবাসার পাত্রী ছিলেন ও তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন'।[১০]

সেই সুরতকুমারী একদিন প্রভু বন্ধু সুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ লাবণ্য দর্শন করে অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি ভূলে গিয়ে পরম পবিত্র জীবন লাভ করেছিলেন। সাধক, মহাপুরুষ ও ভগবানের কৃপায় অনেক পতিতা উদ্ধার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু হীন পতিতাকে উদ্ধার করে সেবাভাগ্য দিয়ে ব্রজের নির্মল প্রেমভক্তির সন্ধান দিয়েছেন কোন মহামানব বা অবতার পুরুষ এমন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। শুধু তাই নয়, তিনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়িটিও প্রভু বন্ধুসুন্দরের নামে লিখে দেন। যা মহাউদ্ধারণ মঠ নামে খ্যাত, যেখানে আজও ভগবানের লীলা মাধুর্য কীর্তন চলছে। এ প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধুর জীবনীকার গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী তাঁর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বলেছেন:

'সুরতকুমারী শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশিত ভজন প্রণালী নৈষ্ঠিক ভাবে জীবনে আচরণ করিতে লাগিলেন। বারবিলাসিনী কঠোর ব্রহ্মচারিণী হইলেন। পতিতা রমণী ব্রজের উজ্জ্বল রসের আস্বাদনে মঞ্জরীর সিদ্ধদেহ লাভ করিলেন। তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্তনে সোনাগাছির পতিতা মহলে এক অভিনব জাগরণ আসিল।'[১১]

এই সকল পতিতাদের সেদিন প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর হরিনামে শুচি স্নাত করে দিয়েছেন; বৈষ্ণবতার আশ্রয়ে তাদের সামাজিক উত্তরণ ঘটেছে। শুধু তাঁরা নয়, তাঁদের প্রভাবে শতাধিক বারবনিতার জীবনে প্রেমভক্তির প্রবাহ এসেছিল। সব মিলিয়ে দেখা যায়, প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তি আন্দোলনসূত্রে বাংলায়ও নারীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রসারিত পরিসর খুঁজে পেয়েছিল। ব্যক্তি জগদ্বন্ধুর স্বভাব-সৌন্দর্য ও মানসিক মাধুর্য, ঔদার্যের দৃষ্টান্তে তাঁরা নাম-প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। উচ্চবর্ণীয় অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক প্রতিবেশে, বন্ধুসুন্দরের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিবাদী সংবেদনশীল নেতৃত্ব এবং প্রভু জগদ্বন্ধুর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বৈষম্যহীন মানবিক প্রশ্রয়ের প্রেরণায় বৈষ্ণব নারীদের জীবনে এসেছিল বাক্ স্বাধীনতা, জীবনযাপনে নারী পুরুষের সমানাধিকার, সংঘবদ্ধ থাকার অধিকার, স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার এবং সর্বোপরি শিক্ষার অধিকার। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতবর্ষে ভক্তির আশ্রয়েই নারী জৈবিক অনুভূমিক স্তর থেকে জগদ্বন্ধুর উল্লম্ব রেখায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল।

তথ্য পঞ্জী :

১। Vidya Dahejja, Antal and Her Path of Love, Suny Press, new York, 1923, Page-104।
২। ব্রহ্মচারী, ড. মহানামব্রত, 'বন্ধুলীলা মাধুরী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮১, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল-৫৯, পৃ-৩।
৩। সুন্দর, প্রভু জগদ্বন্ধু, 'হরিকথা' শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল-৫৯, পৃ-২০৬।
৪। ব্রহ্মচারী, ড. মহানামব্রত, 'বন্ধুলীলা মাধুরী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮১, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল-৫৯, পৃ-৩।
৫। পৃ-২৭।
৬। পৃ-১০১।
৭। পৃ-৫৪৮।
৮। পৃ-৫৪৯।
৯। পৃ-৫৪৯।
১০। পৃ-৪৩৬।
১১। পৃ-৪৪৫।